বুদ্ধদেব-জীবনানন্দ : সম্পর্কের 'সফলতা-নিষ্ফলতা'

সুদক্ষিণা ঘোষ

১৯৪৩ সালে প্রকাশ পেয়েছিল বুদ্ধদেব বসু-র কাব্যগ্রন্থ 'দময়ন্তী'। সমর সেন আর জীবনানন্দ দাশকে উৎসর্গীকৃত বুদ্ধদেবের এই কবিতার বইটি, দুই কবির উদ্দেশেই দুটি উৎসর্গ কবিতা আছে এ-বইতে; সমর সেন-এর উদ্দেশে লেখা 'সমর সেন স্মরণীয়েষু' নামে উৎসর্গ-কবিতাটির তারিখ ১০-১১ জানুয়ারি ১৯৪৩ আর 'বিচিত্রিত মুহূর্ত/জীবনানন্দ দাশ/কবিকরকমলে' নামে উৎসর্গ-কবিতাটি বুদ্ধদেব লিখেছিলেন ১৯৩৬ সালের ১ ডিসেম্বর। জীবনানন্দের উদ্দেশে রচিত ওই কবিতায় বুদ্ধদেব লিখেছিলেন,

সে-পথ নির্জন,
যে-পথে তোমার যাত্রা।
সে-পথে আসে না অশ্বারোহী,
পদাতিক বীর সৈন্য দল।
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা নেই, যান-যন্ত্র মুখরিত নাগরিক জনতার স্রোত নেই;
নেই যোদ্ধা, নেই জয়ী, নেই পরাজিত।
সে-পথ সন্ধ্যার।
শুধু সমুদ্রের স্বর, অন্য কোনো শব্দ নেই।
শুধু সমুদ্রের স্রোত, অন্য কোনো গতি নেই।
একটি জ্বলন্ত তারা,
আকাশের জ্বলন্ত হৃদপিণ্ড যেন,
এঁকে যায় সেই পথ স্বচ্ছ নীল ঝলকে-ঝলকে
সমুদ্রের মানচিত্র-নীলে।

এই নির্জন পথের যাত্রী জীবনানন্দকেই একদিন চিনে নিয়েছিলেন বুদ্ধদেব, যখন বুদ্ধদেব পরিকল্পিত 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের গ্রন্থমালায় আত্মপ্রকাশ করেছিল জীবনানন্দের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা সেন', আর তার পর 'কবিতা' পত্রিকার পাতায় ১৩৪৯-এর চৈত্র সংখ্যায় 'বনলতা সেন' বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় বুদ্ধদেব জানিয়েছিলেন, জীবনানন্দের 'কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল', জানিয়েছিলেন, জীবনানন্দের 'কবিতার সুর একবার কানে লাগলে তাকে ভোলা শক্ত', আর মনে করিয়ে দিয়েছিলেন আধুনিক কবিসমাজে জীবনানন্দের স্বাতন্ত্র্য তাঁর নির্জনতায়, 'তিনি আমাদের নির্জনতম কবি।'

বাংলা কবিতার পাঠক মাত্রেরই জানা, কবি জীবনানন্দ আর সম্পাদক বুদ্ধদেবের দেওয়া-নেওয়ার ইতিহাস আরো কতদিনের পুরোনো, 'কবিতা'রও কত আগে 'প্রগতি' পত্রিকায় বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ-আবিষ্কার, 'শনিবারের চিঠি'-র রূঢ়, অশালীন আর অনুচিত আক্রমণ থেকে প্রিয় কবিকে রক্ষা করবার জন্য বুদ্ধদেবের কত দীর্ঘ দিনের প্রায় একক মসীযুদ্ধ।

আলাপের ইতিহাসটা অবশ্যই আরো একটু পুরোনো। প্রথম চেনাশুনো কবিতাতেই, 'কবিতা' বা 'প্রগতি' পর্বেরও আগেই, 'কল্লোল'-এর পাতায় একটি কবিতা পড়েছিলেন বুদ্ধদেব, ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত সে-কবিতারই নাম 'নীলিমা' আর লেখকের নাম জীবনানন্দ দাশগুপ্ত, 'এমন একটি সুর ছিলো' সে-কবিতায় যে লেখকের নামটি আর কখনো ভুলতে পারেননি বুদ্ধদেব। 'কল্লোল'-এর তৃতীয় বর্ষে জীবনানন্দের এই আত্মপ্রকাশ, অল্প কয়েক সংখ্যা আগে, ১৩৩২-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যাতেই বুদ্ধদেবের প্রথম লেখাও প্রকাশ পেয়েছে 'কল্লোল'-এ। বুদ্ধদেবের বয়স তখন সতেরো, জীবনানন্দের প্রায় এক দশকের অনুজ তিনি।

দুই কবির চেনাশুনোর সেই শুরু, 'কল্লোল'-এর কালে অল্পস্বল্প দেখাশুনোও হয়েছে তাঁদের, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে সঙ্গী করে কখনো বুদ্ধদেব চলে গেছেন জীবনানন্দের প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এর ওপরতলার ঘরে, কখনো দল বেঁধে 'কল্লোল'-এর প্রিয় রেস্তরাঁ ইন্দো-বর্মায় যাওয়ার পথে জীবনানন্দকে চমকে দিয়ে ধরে ফেলেছেন তাঁকে পথের মাঝেই; এমনকি ঢাকাতেও এক আশ্চর্য মেঘলা দিন কেটেছে তাঁদের, মাঠের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন বুদ্ধদেব আর জীবনানন্দ, জীবনানন্দ গিয়েছেন বুদ্ধদেবের পুরানা পল্টনের টিনের বাড়িতে।

আর ১৯৩০ সালে, জীবনানন্দ তখন দিল্লিতে রামযশ কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপক, ঢাকা ব্রাহ্মমন্দিরে লাবণ্য গুপ্তের সঙ্গে বিবাহ হলো তাঁর, বিবাহবাসরে উপস্থিত ছিলেন 'প্রগতি'-সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু আর অজিতকুমার দত্ত; ওই সময়ে বিষ্ণু দে-কে লেখা বুদ্ধদেবের চিঠিও জানায়, ইতিমধ্যেই কলকাতায় পৌঁছেই যেতেন তাঁরা, 'যদি না সামনের শুক্রবার জীবনানন্দের বিয়ে হত'; আর যেহেতু 'ওর বিয়েতে উপস্থিত না থাকা অসম্ভব' কেবলমাত্র সেই কারণেই এই সপ্তাহের পরিবর্তে তাঁরা পৌঁছচ্ছেন আগামী সপ্তাহে।

তবে, জীবনানন্দের বিয়েতে উপস্থিত না থাকাটাই 'অসম্ভব'—বুদ্ধদেব আর জীবনানন্দের প্রথম তারুণ্যের ব্যক্তিগত যোগ যদিও নিবিড় ছিল এতটাই, কবি জীবনানন্দের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা, প্রকাশ আর প্রচারেও বুদ্ধদেবই ছিলেন অনলস, তবু ব্যক্তিগত সখ্য কিন্তু জীবনভর কখনোই খুব গভীর হয়নি তাঁদের, জীবনানন্দের স্বভাব-সঙ্কোচই হয়তো তার অনেকখানি কারণ।

পরিণত বয়সে, যখন দু'জনেই দক্ষিণ কলকাতার কাছাকাছি এলাকারই বাসিন্দা, পথেঘাটে দেখাও হয়ে যায় অনেকসময়েই, তখনও খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না জীবনানন্দ আলাপচারিতায়, বুদ্ধদেবের পথ-চলার সঙ্গী তাঁর মেয়েদের ছোটোবেলার স্মৃতি জুড়েও ধরা আছে এমনি সব ছবিই, কোনো ছবিতে বাবার সঙ্গে তাঁদের দেখে সন্তর্পণে ফুটপাথ বদল করে অন্যদিকে চলে যাচ্ছেন জীবনানন্দ, কোনো ছবিতে আবার তাঁদের এপারে দাঁড় করিয়ে রেখে রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে জীবনানন্দের সঙ্গে একাই কথা বলে আসছেন বুদ্ধদেব; বুদ্ধদেবের ২০২-এর বিখ্যাত কবিতাভবনেও আসতেন জীবনানন্দ, কিন্তু সেখানেও যেন খুব স্বস্তিতে চেয়ারে বসতেন না কখনো, এমন আলগাভাবেই বসতেন সব সময়ে যে মেয়েদের মনে হতো, 'বুঝি পড়েই যাবেন' জীবনানন্দ!

মনে পড়ে, ১৯৫৫ সালে, জীবনানন্দের প্রয়াণের পর 'জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে' বুদ্ধদেব লিখেছিলেন, একটা কোনো 'দুরতিক্রম্য দূরত্ব' ছিল জীবনানন্দের স্বভাবে, যেন তাঁর কবিতার 'অতিলৌকিক আবহাওয়া'ই তাঁকে ঘিরে থাকতো সবসময়, সেই ব্যবধান ব্যক্তিগত জীবনে কখনো অতিক্রম করতে পারেননি বুদ্ধদেব, এই দূরত্ব শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন জীবনানন্দ; তবু, বুদ্ধদেব লিখেছিলেন,

> অথচ সেই 'প্রগতি'-র সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সাহিত্যিক বন্ধুতা ও সাযুজ্য ছিলো বিরামহীন; দেখাশোনায় যেটুকু হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি গভীর করে তাঁকে পেয়েছি তাঁর রচনার মধ্যে—যার অনেকটা অংশের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রকাশের পূর্বেই ঘটে গেছে। এই সম্বন্ধ পঁচিশ বছরের মধ্যে শিথিল হয়নি; 'কবিতা' প্রকাশের অন্যতম পুরস্কার ছিলো আমার পক্ষে একসঙ্গে তিনটি-চারটি করে পাঠানো তাঁর নতুন কবিতা পড়া; আনন্দ পেয়েছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র প্রুফ দেখে, 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় 'বনলতা সেন' প্রকাশে তাঁর সম্মতি পেয়ে, তাঁর বিষয়ে লিখে, কথা বলে, তাঁকে আবৃত্তি করে।

দুই.

এই ছবিটাই তো আমাদের চেনা। এই-ই তো আমাদের চেনা মুখ। বুদ্ধদেবের। জীবনানন্দের। বুদ্ধদেব আর জীবনানন্দের জীবনজোড়া সম্পর্কের এই ধরনটাই তো দীর্ঘ দিন ধরে চেনা বাঙালি পাঠকের।

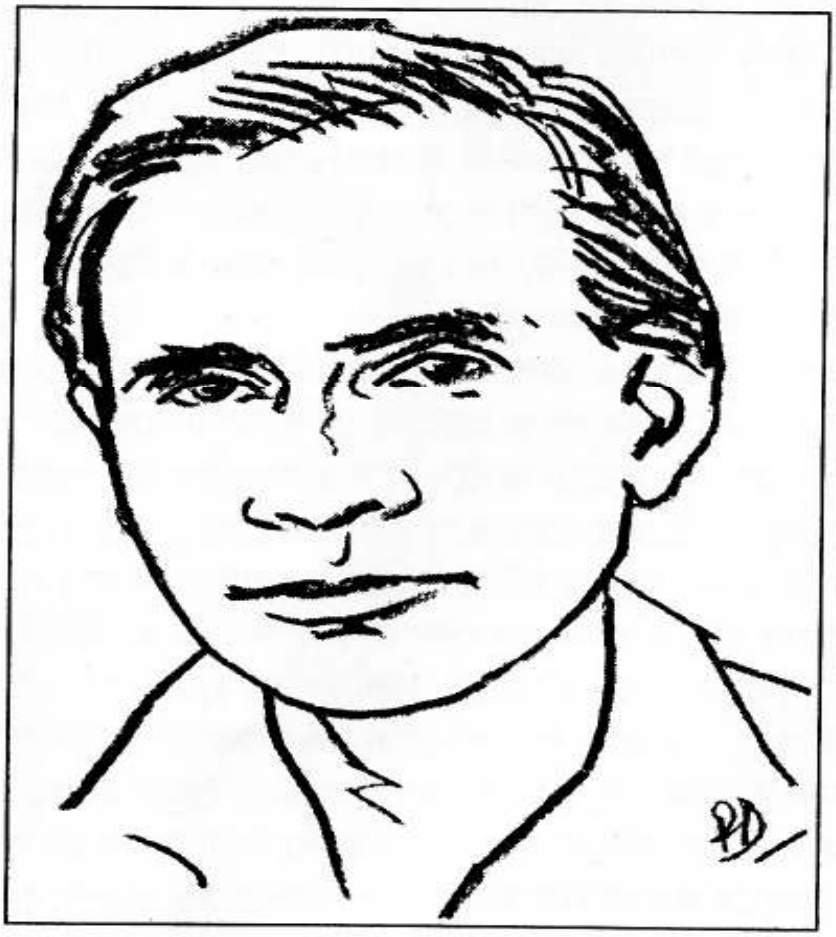

অল্পবয়সে কবি বুদ্ধদেব বসু শিল্পী : প্রকাশ দাশ

কিন্তু এ-মুখের আড়াল থেকেও কি উঁকি দিতে পারে অন্য কোনো অচেনা মুখের আদল? আর কোনো বয়ানের কালো ছায়া কি পারে চেনামুখের এই রেখাগুলো ঢেকে দিতে, পারে কালো অক্ষরের অচেনা আঁচড়ে মুছে দিতে বন্ধুত্বের এই চেনা বিন্যাস?

এমন একটা কথাও যে কখনো ভাবতে পারলো বাঙালি পাঠক, তার কারণ কবি জীবনানন্দ নন, যাঁর কবিতাকে একসময় দু-হাত মেলে 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণ থেকে দিনের পর দিন রক্ষা করে গেছেন বুদ্ধদেব; এমনটাও যে ঘটতে পারলো তার কারণ ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ।

আরো নির্দিষ্ট করে বললে, তার কারণ জীবনানন্দের চারটি খাতা। ১৯৩২ সালের চারটি খাতা। কিন্তু, চারটি মাত্র খাতাও কি এতটা পারে?

পারে কিনা তার বিচার করার আগে দেখে নেওয়া যায় কী আছে ওই চারটি খাতায়। আজকের অনেক পাঠকই জানেন, খাতা চারটি জুড়ে ছড়ানো আছে একটি আখ্যান। অন্য সব উপন্যাসের মতোই, লেখকের জীবনকালে কোনোদিন আলোর মুখ দেখেনি এ-আখ্যান, উপন্যাসটির 'সফলতা-নিষ্ফলতা' নামখানিও স্রষ্টার দেওয়া নয়, সম্পাদনাকালে সম্পাদক ভূমেন্দ্র গুহ বেছে নিয়েছেন উপন্যাসের এই শিরোনাম।

জীবনানন্দের এ-উপন্যাসের নায়ক নিখিল, গল্পের কথক সে-ই, যে থাকে কলকাতার এক বোর্ডিং-এ, একাই; যদিও নিখিল বিবাহিত, দেড় বছরের মেয়েও আছে একটি, বউ আর মেয়ে থাকে তার দেশের বাড়িতেই, আর তার সংসারের সব খরচই চালায় ছোটো ভাই অনুপম, গভর্নমেণ্ট অফিসে একশো তিরিশ টাকা মাইনের চাকুরে এই ছোটো ভাইটি নিজে বিয়ে করেনি, তবে বিবাহিত দাদাকে কলকাতাতেও টাকা পাঠায় সে নিয়মিতই।

বউ-মেয়েকে দেশের বাড়িতে রেখে নিখিল কলকাতায় থেকে চাকরি খোঁজে আর উপন্যাস লেখে। নিখিল ছাড়া আর যে ক-টি উল্লেখযোগ্য চরিত্র আছে এ-উপন্যাসে, তার মধ্যে প্রধান অবশ্যই বাণেশ্বর, আর কিছুটা উল্লেখযোগ্য, শঙ্কর। নিখিল, বাণেশ্বর এবং শঙ্কর —এই তিনটি চরিত্রই সাহিত্যযশঃপ্রার্থী, সাহিত্যরচনাই তাদের জীবনের এক ও অদ্বিতীয় কৃত্য আর বয়সও কাছাকাছিই তিনজনেরই।

'সফলতা-নিষ্ফলতা' নামে এ-উপাখ্যানের অষ্টম অধ্যায়ের শুরুতেই জানা যায়, মফস্বলের পাট উঠিয়ে বালিগঞ্জের দিকে ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকতে শুরু করেছে বাণেশ্বর আর সেই ফ্ল্যাটে তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে নিখিল, আর এর পর থেকে নিখিল-বাণেশ্বর সংবাদই হয়ে উঠেছে এ-উপন্যাসের একমাত্র বিষয়, অষ্টম অধ্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত বাণেশ্বর সম্পর্কে নিখিলের মনোভঙ্গিই প্রধানত ছড়িয়ে আছে আখ্যানের পাতায় পাতায়; তাই, সেই সংবাদে প্রবেশের আগে এইটুকু পাঠককে খেয়াল করে নিতেই হয় যে, নিখিল নামক এই আপাতত কর্মহীন উদ্যমহীন যুবকের চরিত্রে যদি উজ্জ্বল হয়ে উঠে থাকে জীবনানন্দের নিজেরই অন্তর্মুখী স্বভাব, তবে এ-উপাখ্যানের বাণেশ্বর হয়তো অনেকটাই বুদ্ধদেব বসুর ছায়ায় ঘেরা, সম্পাদক ভূমেন্দ্র গুহ-র মতে অবশ্য, প্রধানত বুদ্ধদেব এবং গৌণত বিষ্ণু দে আর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছায়া পড়েছে বাণেশ্বর নামে নিখিলের এই সাহিত্য-সহযাত্রীর চরিত্রে। শঙ্কর নামে অন্য যে কথাসাহিত্যিকটি আছেন উপন্যাসের চতুর্দশ অধ্যায়ের অনেকটা জুড়েই, ভূমেন্দ্র গুহ-র অনুমান, স্বকালীন এই সাহিত্যিকটি প্রেমেন্দ্র মিত্র অথবা শৈলজানন্দ

মুখোপাধ্যায়, অথবা উভয়ের যুগ্ম রূপ; উপন্যাসে শঙ্করকেও দেখা যায় বাণেশ্বরের ফ্ল্যাটেই, দেখা যায় বাণেশ্বরের অনুপস্থিতিতে বাণেশ্বরের ফেলে যাওয়া সিগারেটের টিন থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সেখানেই আড্ডা দিচ্ছেন নিখিল আর শঙ্কর দুজনেই; আর দেখা যায়, পাঠকসমাজে নিখিলের চেয়ে একটু বেশি প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর নামে এই সমকালীন লেখকটি সম্পর্কে বেশ সহৃদয় নিখিলের মতামত, তার উপদেশ নিয়েও কখনো খুব বক্রোক্তি জাগে না নিখিলের মনে।

এই কথাগুলো ঠিক এইভাবেই কিন্তু বলা যায় না নিখিল আর বাণেশ্বরের সম্পর্কের বিচারে, উপাখ্যানের দীর্ঘ বিশ্লেষণ বারে বারেই প্রকট করে দিয়ে যায় যে বাণেশ্বর সম্পর্কে একেবারেই সহৃদয়, এমনকি অনেকসময়েই একেবারেই শোভনও নয় নিখিলের মতামত, বাণেশ্বরের প্রতিষ্ঠা নিয়েও মনে-মনে স্বচ্ছন্দ নয় সে একেবারেই, বাণেশ্বরের দেওয়া উপদেশ, নিখিলের পক্ষে সঙ্গত বা অনেকক্ষেত্রেই শঙ্করের দেওয়া উপদেশের অনুরূপই হলেও, সেসব নিয়েও মনে মনে তার ব্যঙ্গের তীর খুবই শাণিত।

নিখিলের এইসব ভাবনাক্রমের দু-একটিতে চোখ রাখা যায় এখন,

> নিজের পদগৌরব সম্বন্ধে সব সময়ই সে (বাণেশ্বর) খুব খাড়াখোড়া—
> সকলেই তাকে সব সময় তার গরিমা মনে করিয়ে দিচ্ছে...
>
> বাণেশ্বরকে মনে-মনে অবিশ্যি এরা সকলেই ঠাট্টা করে—এর পদপ্রতিভা যে এক ঢিবি বালি দিয়ে তৈরি, নিভৃতে সকলেই তা জানে—...কিন্তু বাণেশ্বরের সম্বন্ধে যথাযথ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার প্রয়াস কোথাও দেখছি না; এইটেই বড় মারাত্মক; শুধু

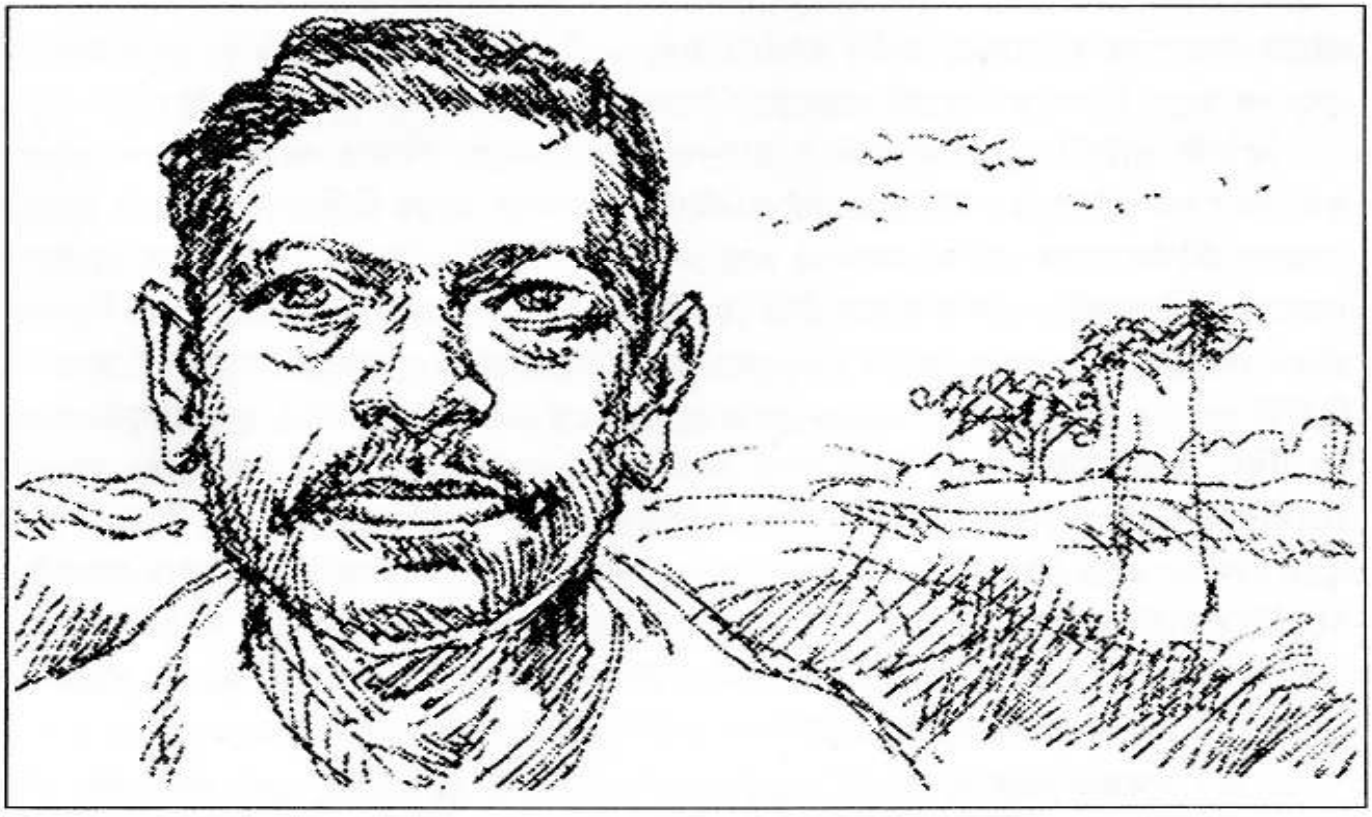

জীবনানন্দ দাশ *শিল্পী : অনুপ রায়*

প্রশংসা—শুধু ঘৃণা—বা, শুধু উপেক্ষা—এই তিনটে জিনিষের শেষ পর্যন্ত একই দাম; —কোনওই দাম নেই। মেয়েরা ওকে ঘেন্না করছে শুধু, মেয়েদের কাকারা প্রশংসা করছে—মেয়েদের বাপেরা করছে উপেক্ষা।...

কিন্তু বাণেশ্বরকে অনেকেই মনে-মনে তাসের বাড়ি মনে করলেও—মুখে না হোক কলমে অন্ততঃ—চিঠিতে প্রবন্ধে—অজন্তার মাতাল পারসীকের চিত্রের মত, মনড্রিয়ানের ছবির মত, হুমায়ুনের কবরের মত—এমন একটা স্পষ্ট, নিহিত, নিরঙ্কুশ সমৃদ্ধি দিচ্ছে, যা পেতে একাল-মানুষের সাহিত্যকে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়—ছেলেমানুষের হাতে যা কিছুতেই জোটে না—কেউ যদি জোর করে গছিয়ে দেয়, তা হলে বাণেশ্বরের যা হয়েছে, তেম্নি হয়—যেমন সাহিত্যের ভিতরে, তেমন জীবনের ঘাটে-পথে সে একটা হাড়হাভাতে হয়ে দাঁড়ায়।

এই হাড়হাভাতেকে আমাদের অনেক দিন সহ্য করতে হবে।

এখনও সে লিখছে—অনেক দিনই সে লিখছে—তার সম্বন্ধে কথাবার্তা সব সময়ই সব-চেয়ে বেশি হবে—কিন্তু আমি যে পরিমাণের কথা বলছি বাণেশ্বর সম্বন্ধে সে জরিপ আরম্ভও হবে না। শীগগির আরম্ভ হবে না।

এই হাড়হাভাতেকে আমাদের অনেক দিন সহ্য করতে হবে।

নিখিলের নিভৃত ভাবনায় বাণেশ্বর সম্পর্কে পুনরাবৃত্ত এই 'হাড়হাভাতে' বিশেষণ, এই বেশ খানিকটা প্রতিষ্ঠা আদায় করে ফেলা সমকালের আধুনিক লেখকটি সম্পর্কে তার প্রবল উষ্মা, হয়তো এর 'প্রকৃত শক্তি ঢের তুচ্ছ, অশক্তি অনেক; হয়তো সপ্রতিভতা ঢের বেশি, প্রতিভা কম কিম্বা অনেকখানি, কিন্তু জট তিল ছুলি ও ব্রনে কদাকার, জন্ম-কদাকার'—এই ধরনের ভাবনায় ভরা তার এই বিপুল ক্ষোভের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই মনে হতে থাকে আজকের পাঠকের, এ কি সত্যি সম্ভব, ১৯৩২-এর জীবনানন্দ দাশ, সেই সময়ের বুদ্ধদেব বসুর দিকে তাকিয়েই মনে মনে বলতে চাইছিলেন এই কথাগুলোই?

এ যদি সত্যিই হয়, যদি সত্যিই বাণেশ্বরের আড়ালে প্রধানত থাকে চব্বিশ বছরের বুদ্ধদেব বসুর মুখ, আর সেই মুখের দিকে এইভাবে তাকিয়ে থাকে নিখিলের আড়ালে তেত্রিশ বছরের জীবনানন্দের চোখ, তবে এ প্রশ্ন জাগবেই বাংলা কবিতার যে কোনো পাঠকের মনে। প্রশ্ন জাগবেই—কোন সময়ে দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবছে নিখিল, এসব কথা লিখছেন জীবনানন্দ? ১৯২৯ সালে, মাত্রই তিন বছর আগে বন্ধ হয়েছে বুদ্ধদেবের 'প্রগতি', মাত্র এই তিনটি বছরের মধ্যেই কি জীবনানন্দ ভুলে গেছেন যে এই সেই 'প্রগতি', যে নিঃশর্ত সমর্থন করেছিল তরুণ জীবনানন্দকে, যে কথা মনে করে একদিন 'আমার যৌবন'-এ বুদ্ধদেব লিখেছিলেন, 'গণ্ডার-কবি'কে নিয়ে যখন অট্টহাসির রোল উঠেছিল চারিদিকে, অন্য কোথাও যখন ছিল না আর কোনো সমর্থনসূচক প্রয়াস, তখন সেই 'ক্ষুদ্র মঞ্চটিতেই প্রথম সংবর্ধিত' হয়েছিলেন জীবনানন্দ, 'প্রকাশ্যে, একক কণ্ঠে, সোচ্চার ঘোষণায়।' কিংবা, 'জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে' নামে বুদ্ধদেবের সেই বিখ্যাত লেখাটিও কি মনে পড়বে না আজকের পাঠকের, সে-সব দিনের কথা মনে করেই যেখানে একদিন লিখেছিলেন বুদ্ধদেব,

সেই দু-বছর বা আড়াই বছর, যে-ক'দিন 'প্রগতি' চলেছিলো, আমি বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলাম, শুধুমাত্র সদর্থকভাবে নিজের কথাটা প্রকাশ না-ক'রে প্রতিপক্ষের জবাব

> দিতেও চেয়েছিলাম—সেই সব আক্রমণেরও উত্তর, যাতে আক্রোশের ফণা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, আর ইতর রসিকতার অন্তরালে দেখা যাচ্ছে পান-খাওয়া লাল-লাল দাঁত, কালচে মোটা ঠোঁট, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসনের ঘূর্ণিত, লোলুপ, ব্যর্থকাম দৃষ্টি। এই রকম আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন জীবনানন্দ, আর তাতে আমার যেমন উত্তেজনা হ'তো, নিজের বিষয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তেমন হ'তো না; যেহেতু তাঁর কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম, আর যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, তাই আমার মনে হ'তো তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য।

জীবনানন্দ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের এসব লেখা অবশ্যই ১৯৩২ সালের অনেকটাই পরের, কিন্তু ১৯৩২ সালেও বুদ্ধদেব বসু নামে মানুষটির মনোভাব কি এতটাই অজানা থাকবার কথা জীবনানন্দেরও? ১৯২৭ থেকে ১৯২৯—'প্রগতি'-র স্বল্পায়ু জীবনকালে যেমন, আজীবন কি তেমনই অসূয়াহীন ছিলেন না বুদ্ধদেব?

এই অসূয়াহীনতার কথা অবশ্য উপন্যাসের নিখিলও বলে, বাণেশ্বর সম্পর্কেই বলে, কিন্তু যেভাবে বলে, তা যদি সত্যিই বাস্তবের বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে বাস্তবের জীবনানন্দ দাশের মনোভঙ্গি হয়, তবে এর চেয়ে অন্যায় আঘাত, এর চেয়ে নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞতাই বা আর কী হতে পারে? নিখিল বলে,

> বাণেশ্বরের মনের ভিতর হিংসা খুব কম—নেই বল্লেই হয়; সে জানে, নিজে সে সব-চেয়ে বড়—নিমবড়কে সাহায্য করতে সে সব সময়েই রাজি।

এই প্রসঙ্গেই একটা দীর্ঘ বিবরণও দিয়ে যায় নিখিল, জানায় কোন কোন পথে তাকে সাহায্য করতে চেয়েছে বাণেশ্বর, নিয়ে যেতে চেয়েছে কোন কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি, প্রকাশনা-পুরস্কারের কতরকম স্বচ্ছন্দ গতিপথ বাতলে দিতেও চেয়েছে কতবার, আর এই সব চাওয়ার কোনোটাতেই খুব আন্তরিকতার অভাব আছে বলেও কখনো মনে হয় না নিখিলের, অন্তত তেমন মনে হওয়ার কথা তো একবারও বলে না সে; তাই খুব স্পষ্ট বোঝা যায় না, এই আন্তরিক সহায়তার প্রস্তাব প্রসঙ্গে তার ভাবনাটা তবে এমন বাঁকা পথেই গেল কেন? সমসাময়িক সমব্যবসায়ী কারো মনে হিংসা না থাকা, যথাসম্ভব সহায়তার উদারতা থাকা সেই মানুষটির বেশ বরণীয় একটি গুণ হিসেবেই বিচার্য হতে পারতো, অথচ নিখিলের নিশ্চিতভাবেই মনে হলো, বাণেশ্বরের অমূলক দম্ভ, নিজের সম্পর্কে হাস্যকর উচ্চ ধারণাই তার এই সব সহায়তা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র উৎস।

আর নিখিল-বাণেশ্বরের মুখোশের আড়ালে যদি সত্যিই খেলা করে যায় জীবনানন্দ-বুদ্ধদেবের দ্বৈধ, আজীবন জীবনানন্দ-অনুরাগী কোনো আজকের পাঠকেরও কি তবে এমনটাই মনে হবে না যে সহায়সম্বলহীন বুদ্ধদেব যে শুধুমাত্র কলমের জোরে একদিন জীবনানন্দের জন্যই একটা অসম কিন্তু সমর্থ লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন সবল প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে, হার মানেননি এক মুহূর্তের জন্যও, সেজন্যে কি তবে কোথাও হীনম্মন্যতা ছিল জীবনানন্দের, তাই কি বারে বারে এই 'নিমবড়' প্রসঙ্গ এনে সেদিনের ওই একলা তরুণের লড়াইটাকে এমনভাবে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছে উপন্যাসের নিখিল?

নইলে, এমন কথা তো আর কারো মনে হয়নি কখনো, বুদ্ধদেব বসুর অসূয়াহীনতা ঘিরে এমন ব্যাখ্যাও জাগেনি আর কারো মনে, ধরা যাক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠাবার, সুভাষের কবিতা প্রসঙ্গে তাঁর মতামত চাইবার প্রাথমিক সব উদ্যোগও তো বুদ্ধদেবেরই, অথচ 'কলকাতা' পত্রিকার 'বুদ্ধদেব বসু' সংখ্যায় 'শাপভ্রষ্ট দেবশিশু' প্রবন্ধে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো লিখেছিলেন,

> ...আমার অবাক লাগে, অবিরাম নিজে লিখেও অন্যের লেখা সম্বন্ধে কি ক'রে একজন এতটা শ্রদ্ধা এতটা আগ্রহ দেখাবার ফুরসত ক'রে উঠতে পেরেছেন! যখন 'প্রগতি' বেরিয়েছে, বলতে গেলে তখন থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সারথ্য তাঁর হাতে। তাই প্রতিপক্ষ সবচেয়ে বেশি শরবর্ষণ করেছেন তাঁরই বিরুদ্ধে। সমকালীন লেখকদের মুক্তকণ্ঠে স্বাগত জানানো, অঙ্কুরেই প্রতিভাকে চিহ্নিত করা, বুক দিয়ে আগলানো সাহিত্যে এভাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজ আর কে করেছেন? অথচ তার মধ্যে বিন্দুমাত্র মুরুব্বিয়ানার ভাব নেই। বাংলা সাহিত্যে তাঁর ভূমিকা পৃষ্ঠপোষকের নয়, প্রহর-জাগা শান্ত্রীর কিংবা সেনাপতির।

এইরকম এক 'সেনাপতি'ত্বের অভ্যাসই বুদ্ধদেবের আজীবন, সমকালের আর অনতি-উত্তরকালের প্রতিটি সম্ভাবনাময় কবিকে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় প্রতিষ্ঠা দেবার এমন একটা সচেতন লড়াই-ই চিরকাল করে এসেছেন তিনি, তাঁর এই পরিচয়টাই তো আবহমান। কেবল 'প্রগতি' নয়, 'কবিতা' নয়, আরো কতবার আরো কতজনের জন্যই তো এমনটা করেছেন বুদ্ধদেব। আশালতা সিংহের পাণ্ডুলিপি নিয়েও তো কতদিন প্রকাশকের দোরে দোরে ঘুরেছেন তরুণ বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেবের হার-না-মানা উদ্যোগেই একদিন প্রকাশ পেয়েছে আশালতার প্রথম উপন্যাস 'অমিতার প্রেম'; জীবনানন্দরও কি কখনো মনে পড়বে না, ১৯৩৬ সালে তিনি নিজে যখন বরিশালবাসী, কলকাতায় বসে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, প্রুফ দেখা —এ সব কিছুর তদারকির পর বুদ্ধদেবের তত্ত্বাবধানেই জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র প্রকাশমুহূর্তটি? কৃতজ্ঞতাবোধে যে বই জীবনানন্দ উৎসর্গও করেছিলেন বুদ্ধদেবকেই?

'সফলতা-নিষ্ফলতা' নামে আখ্যাত ওই চারটি খাতার জন্ম অবশ্য তার আগেই, ১৯৩২ সালে, তখনও কলকাতার এক বোর্ডিং-এর বাসিন্দা জীবনানন্দ, তখনও অজাত তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', তখন বুদ্ধদেবও একটা টিঁকে থাকার লড়াই-ই লড়ছেন, তবু কলকাতার সাহিত্য-সমাজে হয়তো জীবনানন্দের চেয়ে বুদ্ধদেব তখন আরেকটু বেশিই পরিচিত নাম, আর হতেও পারে সেটা তাঁর কথাসাহিত্যিক পরিচয়ের জন্যই।

কিন্তু এ খাতাগুলি তো কেবল ওই একটা বিশেষ সময়ের চিহ্নই বহন করে না আজ, এ-খাতার মন্তব্যগুলি তো জীবনভর সংরক্ষণ করেই গেছেন জীবনানন্দ, সম্পাদক ভূমেন্দ্র গুহ জানিয়েছেন, একাধিকবার পরিমার্জনাও করেছেন জীবনানন্দ এ-লেখার, কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশের পর, 'বনলতা সেন' প্রকাশের পর, বুদ্ধদেব 'কবিতা' পত্রিকার পাতায় 'বনলতা সেন'-এর সমালোচনা লেখবার পর, বুদ্ধদেবের 'দময়ন্তী' প্রকাশের পর, চারটি খাতা জুড়ে এসব কথার একটি আঁচড়ও তো বদল করেননি জীবনানন্দ!

তবে, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 'সফলতা-নিষ্ফলতা' নামে এক উপন্যাসের পাতা উল্টে যেতে যেতে এই কথাটাও একসময় মনে হতে থাকে একালের উপন্যাস-পাঠকের, মনে হয়, যতই আত্মজৈবনিক শোনাক উপন্যাসের অনেক তথ্যই, 'সফলতা-নিষ্ফলতা' বা কোনো উপন্যাসই তো আর আত্মজীবনী নয় জীবনানন্দের, 'সফলতা-নিষ্ফলতা' নামে এই উপাখ্যানখানি তাঁর ১৯৩২-এর দিনলিপিও নয়; জীবনানন্দ নিজেও তো তখন নিখিলের মতোই কলকাতার বোর্ডিংয়ে নিরিবিলি বসে মকশো করছেন কথাসাহিত্যের কয়েক পৃষ্ঠা, সেসব পাতায় আশেপাশের চেনাশোনা চরিত্রের, চেনা মুখের আদল এসে মিশবে, তা যেমন স্বাভাবিক, তেমনিই স্বাভাবিক নয় কি চরিত্রনির্মাণের স্বাভাবিক ছন্দেই সেসব আপাত চেনা মুখের আদলে মিশে যাবে আরো অনেক রঙ-বেরঙের আঁচড়, মিশবে স্রষ্টার কল্পনার ঐশ্বর্য? নিখিল, বাণেশ্বর বা শঙ্কর তো আদতে জীবনানন্দ দাশের একটি উপন্যাসের তিনটি বর্ণময় চরিত্রই।

এইরকম ভাবে ভাবতে পারলে, ভেবে এই মিতায়তন উপন্যাসটি পড়ে ফেলতে পারলেই স্বস্তি বোধ করতে পারতো আজকের পাঠক, হয়তো মিলতো তার উপন্যাসপাঠের অনাবিল তৃপ্তির স্বাদ, কিন্তু এমন স্বস্তিকর তৃপ্তিদায়ক ভাবনার পথে প্রথম বাধা এই বইয়ের সম্পাদক। জীবনানন্দের অন্য যে কোনো বইয়ের তুলনায় অনেক বেশি ভূমিকা-টীকার ভারে আচ্ছন্ন তাঁর এ-উপন্যাস, পাতার সংখ্যা গুনে হিসেব করলে দেখা যাবে, ভূমিকা আর টীকার যোগফল মূল উপন্যাসের পৃষ্ঠাসংখ্যার চেয়ে বেশিই, আর 'গড়পড়তা পাঠকের' জন্য লেখা এই সম্পাদকীয় অংশটিতেই উপন্যাসের বাণেশ্বর প্রসঙ্গে যে কোনো ঘটনাতেই সম্পাদক সাক্ষ্য খুঁজেছেন বুদ্ধদেবের কোনো না কোনো জীবনকথার, টীকায় ক্রমশ মিলিয়ে দিতে শুরু করেছেন, 'বাণেশ্বর/বুদ্ধদেবের চটে যাওয়ারই কথা'; বা, 'বাণেশ্বর/বুদ্ধদেবের বক্তব্যটা এই'; কিংবা, 'বুদ্ধদেব/বাণেশ্বর কি কখনও নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন নি এ-সব সভায়?' ইত্যাদি বাক্যে ক্রমান্বয়ে সমীকৃত করে গিয়েছেন বাস্তবের আর উপন্যাসের দুটি চরিত্রকে।

তবে আমরা, আজকের পাঠকেরাই বা এসব তথ্যের দিকে একেবারে উদাসীন থাকি কী করে আজ, যখন নিখিল-বাণেশ্বর প্রথম সাক্ষাতেই নিখিলের অভিমানসঞ্জাত এই কথোপকথনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় আমাদের, শুনতে পাই নিখিলের মুখে,

> সে একদিন ছিল, বাণেশ্বরবাবু, যখন আপনি একটা কাগজ চালাতেন—একটা কবিতা পাঠালেই সেটার সম্বন্ধে তিন পৃষ্ঠা মন্তব্য অমনি আমাকে লিখে জানাতেন। আপনার মত ডিভোশন নিয়ে কেউ আমার কবিতা পড়ে দেখে নি—আমার জিনিষ কেউ ছাপায়ওনি এত—আপনার কাছ থেকে আমি যথেষ্ট আস্কারা পেয়েছি—সে-ঋণ আমি ভুলতে পারব না কোনওদিন, বাণেশ্বরবাবু।

তখন অনতি-অতীত একটা সময়, চেনা দুটো মুখ জ্বল জ্বল করে ওঠে তো আজকের পাঠকের সামনেও। তবে, নিখিলের সে-সময়ের লেখালেখি ঘিরে বাণেশ্বরের এই 'ডিভোশন', তার এই 'আস্কারা'র কথা আজও অস্বীকার করতে পারে না বটে নিখিল, তবে এখন তার অনেক ক্ষোভ আজকের বাণেশ্বর সম্পর্কে, অভিযোগও অনেক, এক তো, বাণেশ্বর অনেককে বই

উপহার দিলেও, নিখিলকে দেয়নি, খুব স্পষ্টই ইঙ্গিত করতে চেয়েছে নিখিল যে, তাদেরই উপহার হিসেবে নিজের বই দেয় বাণেশ্বর, যাদের দিয়ে কোনো লাভ হবে তার, নিখিল সে-দলে পড়ে না বলেই বাণেশ্বরের সুনিপুণ সুচতুর হিসেব থেকে বাদ গেছে সে।

তিরিশের দশকের কলকাতা শহরের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সঙ্গে যুঝতে থাকা এক সাহিত্যব্রতী তরুণ, কোনো চাকরি নয়, শুধু কলম-পেষা কিছু অক্ষরই যার ভরণপোষণের নির্ভর, অল্পদিন আগেই মফস্বল-আগত হলেও খুব দ্রুত যে রপ্ত করে নিয়েছে শহুরে চালিয়াতির কলাকৌশল, খুব সহজে বুঝে নিয়েছে শর্ট কাটে পাঠকের মন জয় করবার নিশ্চিত পথ, শিখে নিয়েছে প্রকাশককে আকৃষ্ট করবার সঠিক ফাঁকফোঁকর, স্থায়ী আয় না থাকা সত্ত্বেও অর্জন করে নিয়েছে আরামে-আয়েসে-বিলাসিতায় ডুবে যাওয়ার অধিকার— অল্পস্বল্প বাস্তবের মাটি ছুঁয়েও যদি কল্পনা দিয়েই গড়া হয়ে থাকে সাহিত্যযশোলিপ্সু এই যুগপ্রতিনিধিটিকে, তবে 'সফলতা-নিষ্ফলতা'র অধিকাংশ পাতা জুড়ে ব্যঙ্গ শ্লেষ আর পরিহাসের কুশলতায় একেবারে ঝলমল করে উঠেছে কথাসাহিত্যিক জীবনানন্দের কলমে আঁকা বাণেশ্বরের এই মুখখানি।

কিন্তু যদি কল্পনা আর বাস্তবের এই সীমারেখা টানবার সুযোগ মেলে কোনো পাঠকের, তবেই তো? আমাদের যে শুনতে হয়, কেন বাণেশ্বর আর যায় না নিখিলের বোর্ডিঙে, যাওয়ার সময়ই পায় না, তার কারণ এখন 'কাঁচিছাঁটা কবিতা নিয়ে চারদিকে বেড়াতে হয়' তাকে; একবার নয়, এই একই ধরনের কথোপকথন শুনি আমরা এর পরেও, এই একাদশ অধ্যায়েই; অন্য সব অধ্যায়ের মতোই, নিখিলের প্রশ্ন আর বাণেশ্বরের উত্তরে আবারও শুনি,

> —সব-চেয়ে বড় কবির যশ কী করে জোগাড় করলেন?
> —আমি? কাঁচিছাঁটা করে কতকগুলো কবিতা পাঠালাম।

একাধিকবারই শুনি যাঁর কাছে পৌঁছল এই 'কাঁচিছাঁটা কবিতা', তাঁর সার্টিফিকেটের প্রসঙ্গটিও; এই সার্টিফিকেট আদায় করে ফেলে সাহিত্যের পথে যে এক ধাপ এগিয়ে গেছে বাণেশ্বর, নিখিলের এই মনস্তাপও আর অস্পষ্ট থাকে না খুব। খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও কি একটা প্রশ্ন তখন জাগতে শুরু করে না আমাদের মনে, মনে হয় না যে এইরকম একটা ঈর্ষাই কি তবে নিঃশব্দে মনে-মনে বহন করে গেছেন জীবনানন্দ? এই কথাই মনে আসে কারণ অন্তত এই প্রসঙ্গটাকে তো নিছক কারো ঔপন্যাসিক কল্পনা বলা যায় না কোনো মতেই, বুদ্ধদেবের জীবনের যে কোনো মনোযোগী পাঠকই তো জানেন, 'কাঁচি-ছাঁটা পাতায়'ই তরুণ বুদ্ধদেবের কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন দিলীপকুমার রায়, খণ্ডিত কবিতাগুলির প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায়, জীবনানন্দের এই উপন্যাস রচনার কিছুদিন আগেই, 'নবীন কবি' শিরোনামে লিখেছিলেন, 'কেবল কবিত্ব-শক্তিমাত্র নয়', বুদ্ধদেবের মধ্যে 'কবিতার প্রতিভা রয়েছে, একদিন প্রকাশ পাবে'; রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধই কি তবে নিখিল বর্ণিত সেই সার্টিফিকেট, আর অনুজ সাহিত্যিকের সেই প্রাপ্তিটিই এতটা বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে জীবনানন্দকে?

আরো একবার 'সফলতা-নিষ্ফলতা'র পাতা উল্টোতে উল্টোতে মনে হয়, কেবল সম্পাদক ভূমেন্দ্র গুহই বারংবার তাঁর টীকাটিপ্পনিতে বুদ্ধদেব/বাণেশ্বর লিখে লিখে বা

বাণেশ্বরের জীবনের ঘটনাক্রম বারে বারেই বুদ্ধদেবের আত্মজীবনকথার উদ্ধৃতি দিয়ে সমর্থন করতে চেয়ে তাঁর গড়পড়তা পাঠককে একটি নির্দিষ্ট ভাবনায় চালিত করতে চাননি, বাণেশ্বর চরিত নির্মাণ করতে বসে স্রষ্টা জীবনানন্দও এমন কিছু অভ্রান্ত সংকেত ছড়িয়ে দিয়েছেন, যেসব গুণ বা অভ্যাস অনেকেই চিনে নিতে চাইবেন খুব সহজেই।

বাণেশ্বরকে কেন ভালোবাসে জানাতে বসে দ্বাদশ অধ্যায়ে নিখিল একবার জানায় তারা দুজনেই এম.এ, যেখানে অন্য নামজাদা আধুনিকরা প্রায় সকলেই ইউনিভার্সিটির সম্পর্কহীন, কারো বিষয়েরই স্পষ্ট উল্লেখ করে না নিখিল, তবে যখন বলে, আর কোনো সমকালের লেখকের সঙ্গেই ঠিক কীটস বা ফ্যানি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আসর জমানো যায় না, তখন দুজনেরই উচ্চশিক্ষার বিষয়টা অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না পাঠকের। শুধু এম.এ.-র টেক্সটই নয়, বাণেশ্বরের পড়াশোনা বিষয়েও উদার স্বীকৃতি জানায় নিখিল, 'বইও আমাদের সকলের চেয়েই সে ঢের বেশি পড়েছে—আরও পড়ছে—বরাবরই পড়বে', একথাও বলে যে, 'একমাত্র বাণেশ্বরের কাছে গেলেই বুঝতে পারা যায় যে, গত বছরও যে বইগুলো বেরিয়ে গেছে, আজ তা নিয়ে কথা বলা চিংড়ির ছিবড়ে'।

এ সবই নিখিলের অকৃত্রিম গুণগ্রাহিতা বলে বিশ্বাস করে নিতে ইচ্ছে করতো, যদি তার কথায় মাঝে মাঝেই অন্য ইঙ্গিত ঝিলিক দিয়ে না যেত। নিখিলের অনুসন্ধিৎসার উত্তরে বাণেশ্বরের মুখে আমরা যে অনেকবারই নানা ভাষায় এই জাতীয় হামবড়াই শুনি,

> যখন প্রথম সাহিত্য আরম্ভ করেছিলাম, তখন মনে হয়েছিল যে, লোকে খাবে বলে অশ্লীলতা—তার ধুয়োই—বরাবর গল্পে উপন্যাসে কবিতায় চালিয়ে নিতে হবে—না হলে নাম-ডাক দুদিনেই টসকাবে। কিন্তু এখন দেখছি, তা নয়, খাঁটি শভিয়ান যদি হতে পারি—কিম্বা সেরকম হওয়া খুব কষ্ট বোধ হলে অন্ততঃ আলডাস হাক্সলির বইগুলো খুলে রেখে গল্পের পর গল্প—উপন্যাসের পর উপন্যাস—লিখে চলতে পারলে আসবে বাহবা।

আর শুনতে শুনতে চমকে উঠি, এ কার কণ্ঠস্বর? বুদ্ধদেবের প্রথম তারুণ্যের লেখালেখির বিরুদ্ধে এইরকম অভিযোগ দিনের পর দিন মাসের পর মাস অটুট নিষ্ঠায় করে চলেছিলেন তো সজনীকান্ত, 'শনিবারের চিঠি'-র পাতায় পাতায় কখনো হাক্সলি-র 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট', কখনো 'ক্রোম ইয়েলো'র পংক্তির পর পংক্তি উদ্ধার করে কুম্ভিলকবৃত্তির অভিযোগও প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে, সজনীকান্তের সেই অভিযোগের সমর্থনেই কি তবে এখন সিলমোহর লাগিয়ে দিলেন জীবনানন্দ, এইভাবে বাণেশ্বরেরই বয়ান ব্যবহার করে সত্যের মান্যতা দিলেন সেই সব বাজার-চলতি জনশ্রুতিকেই?

অথচ, সে-সময় থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আজকের পাঠকও ভুলতে পারে না, এই সজনীকান্তই কী নিষ্ঠুর আর অশোভন আঘাত করে চলেছিলেন বুদ্ধদেব এবং তাঁর সহযাত্রীদের প্রত্যেককে, বিশেষত কীভাবে তিনি ক্ষতবিক্ষত করেছিলেন জীবনানন্দকে। সেসব কথা যে সারাজীবন ভোলেননি বুদ্ধদেব, কোনোদিন ক্ষমাও করেননি সজনীকান্তকে, তাও মনে পড়ে আজকের পাঠকের; মনে পড়ে, জীবনানন্দের দুর্ঘটনা-উত্তর সময়ে অনেক সহায়তাই করেছিলেন সজনীকান্ত, হাসপাতালে আহত জীবনানন্দকে তাঁর উদ্যোগেই দেখতে এসেছিলেন ডঃ বিধানচন্দ্র

রায়; কিন্তু জীবনানন্দের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের শোকম্লান উপাসনাসভার মাঝেও সজনীকান্ত সম্পর্কে নিজের সুকঠোর ক্ষমাহীন মনোভাব জানিয়ে দিতে ভোলেননি বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ স্মরণে শোকসভা আয়োজনের প্রস্তাব ওঠা মাত্রই সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়েছিলেন আর সেই সঙ্গেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, এই সভার উদ্যোগে সজনীকান্তের সংযোগ অবাঞ্ছিত তাঁর কাছে, আর যদি তার পরেও সজনীকান্ত থাকেনই, তবে, খুব কেটে কেটে স্পষ্ট স্বরে বলেছিলেন বুদ্ধদেব, তিনি অন্তত থাকবেন না তেমন কোনো উদ্যোগেই। সভা ভেঙে গিয়েছিল তার পর কিন্তু ভাঙা যায়নি বুদ্ধদেবের সেই অনমনীয়তা। জানতে ইচ্ছে হয় খুব, সত্যিই কি সেই মানুষেরই আদলে এমন একটি বাণেশ্বর গড়ে বাক্সবন্দী করে রেখে চলে গেলেন জীবনানন্দ?

বাণেশ্বরকে ঈর্ষা করবার অবশ্য আরো অনেক বিষয় আছে নিখিলের এ-উপন্যাসে, সেটা কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে তার অনভিলষিত প্রতিষ্ঠাই নয়; সাহিত্যপ্রসঙ্গ নিয়ে, একা শয্যায় বহু রাতের রমণীয় শরীরবিলাস আর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্লিম ছুঁড়িদের ঘিরে বাণেশ্বরের অভিজ্ঞতার সামর্থ্য নিয়ে নানা আলোচনা করতে করতেও বাণেশ্বরের দিনযাপনের ছন্দের দিকেও বেশ ঈর্ষাতুর চোখ মেলে রাখে নিখিল, চেয়ে থাকে তার দুই বা তিন কামরার পর্দা-ওড়া ফ্ল্যাটের দিকে, তার চোরাবাজারে কেনা সোফা, অকশনে কেনা চেয়ারের দিকে, দেখে সকালে আসা তিন-চারখানা ইংরেজি খবরের কাগজ, দুধ, ডিম, দামি চা, টোস্ট, এই সব কিছু দেখতে দেখতেই 'আমেজ জেগে' উঠতে থাকে নিখিলের মনে।

তবে বাণেশ্বরের এই দিনযাপনের ছবির আড়ালেও বুদ্ধদেবকে খুঁজতে চাইলে খুব সহজ হবে না বাণেশ্বরের সঙ্গে তাঁর সাংসারিক ছবিটি মেলানো। বুদ্ধদেবের রমেশ মিত্র রোডের আড়াই কামরার ফ্ল্যাটটির সঙ্গে বাণেশ্বরের ফ্ল্যাটের বহিরঙ্গ ছবি অবশ্য অনেকটাই মেলে, সে ফ্ল্যাটেও পর্দা ছিল, বেতের আসবাব ছিল, কিন্তু এমন রমণীয় শরীরবিলাসের সুযোগ ছিল কোথায় তার, আড়াই কামরার আড়াইটে ঘরে যে ছিলেন তিনটি মানুষ—বুদ্ধদেব, দিদিমা স্বর্ণলতা, দাদামশায়ের মামিমা বামাসুন্দরী।

উপন্যাসটা আবার পড়তে পড়তে অনেকবার ভেবেছি, বাণেশ্বরের জীবনযাপনে এত নজর কেন নিখিলের? নিখিলই বা মন্দ আছে কীসে? নিখিলের আবাস 'বোর্ডিঙের বাড়িটাও কলকাতা শহরের বেশ একটা দামি জায়গা'তেই, সে নিজেই জানায়, 'বড় রাস্তার দিকেই ঘর নিয়েছি—তেতলায়। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ট্রাম-বাসের হুড়োহুড়ি দেখি; সন্ধ্যার সময় গ্যাসের আলো জ্বলে ওঠে সব; কোথায় পিলুবারোয়াঁয় বাঁশি বাজে;...' খুব নিরিবিলিও তার এই বোর্ডিঙ, 'লিখবার পড়বার সুবিধে বেশ আছে', আর দুপুরবেলা অন্য বাসিন্দারা সকলেই চলে যায় অফিসে কলেজে নিজের কাজে, নিখিল তখন খেয়ে-দেয়ে বারান্দায় চেয়ার টেনে একটু বসে, কিম্বা চুরুটটা জ্বালায়, একটু পায়চারি করে।

পাশাপাশি দু-জনের দিকে তাকিয়ে মনে পড়েছিল, নিখিলই একবার বলেছিল, বাণেশ্বর আলসেমিকে প্রশ্রয় দেয় না, আর নিজে অলস বলে তার 'নিরবচ্ছিন্ন খাটুনির এই কায়দা'টা দেখতে খুব ভালো লাগে নিখিলের, কথাগুলো আপাদমস্তক ব্যঙ্গে চুবিয়েই বলেছিল নিখিল, কিন্তু যতই ব্যঙ্গ করুক নিখিল; ফ্ল্যাট, সোফা, দুধ, ডিম, দামি চা, টোস্ট, যা-ই থাক এই 'হাড়হাভাতে' বাণেশ্বরের, যেমনই হোক সেসব, সমস্তই তো সত্যিই তার নিজেরই উপার্জন,

তার তো কোনো গভর্নমেণ্ট চাকুরে ছোটো ভাই নেই, ছ'মাস ধরে বিনা পরিশ্রমে মাসের প্রথমে চল্লিশ টাকা হাতে আসবার এই নিরাপত্তার আশ্বাসও কেউ কখনো দেয়নি তাকে, এই কঠিন সময়ে এই দিনযাপন তার একলার দুরূহ শ্রমেরই অর্জন।

চাকরি খুঁজতে সত্যি উপন্যাসে কখনো দেখা যায়নি নিখিলকে, যেসব চাকরি সে কখনো পেয়েছে, বা পেতে পারত, তা পেতে খুব উৎসুকও হয়নি সে, বরং বিশ্বাস করেছে, 'আমার জীবন ঢের বিস্তৃত—আমার ভালোবাসা বা সফলতা একজন করিৎকর্মা গার্ড বা নামজাদা প্রফেসরের জীবনটুকুতে মাত্র পর্যবসিত করে ফেলতে আমার অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়।'

নিখিল আর বাণেশ্বরকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে একবার গড়পড়তা পাঠকের চোখে তাকিয়ে দেখে ভাবি, নিখিলের আড়ালে এ-দর্শন যদি জীবনানন্দের নিজেরই হয়, তবে শিল্পী বলে, সাহিত্যব্রতী বলে, অভিজাত এই বেদনা বোধের অধিকার কি ছিল না বুদ্ধদেবেরও? জীবনানন্দের এ-উপন্যাস লিখতে বসার মাত্র এক বছর আগেই তো তিনিও এসেছেন কলকাতায়, কোনো আর্থিক সমৃদ্ধি নিয়ে নয়, উপার্জনের নিশ্চয়তা নিয়ে নয়, তিন বছর আগে একটি পত্রিকা তাঁকে বন্ধ করে দিতে হয়েছে চূড়ান্ত অর্থাভাবেই, বন্ধ হওয়ার আগে তা নিঃশেষে দগ্ধ করে নিয়ে গেছে একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের যাবতীয় সম্বল, দাদামশায়ের

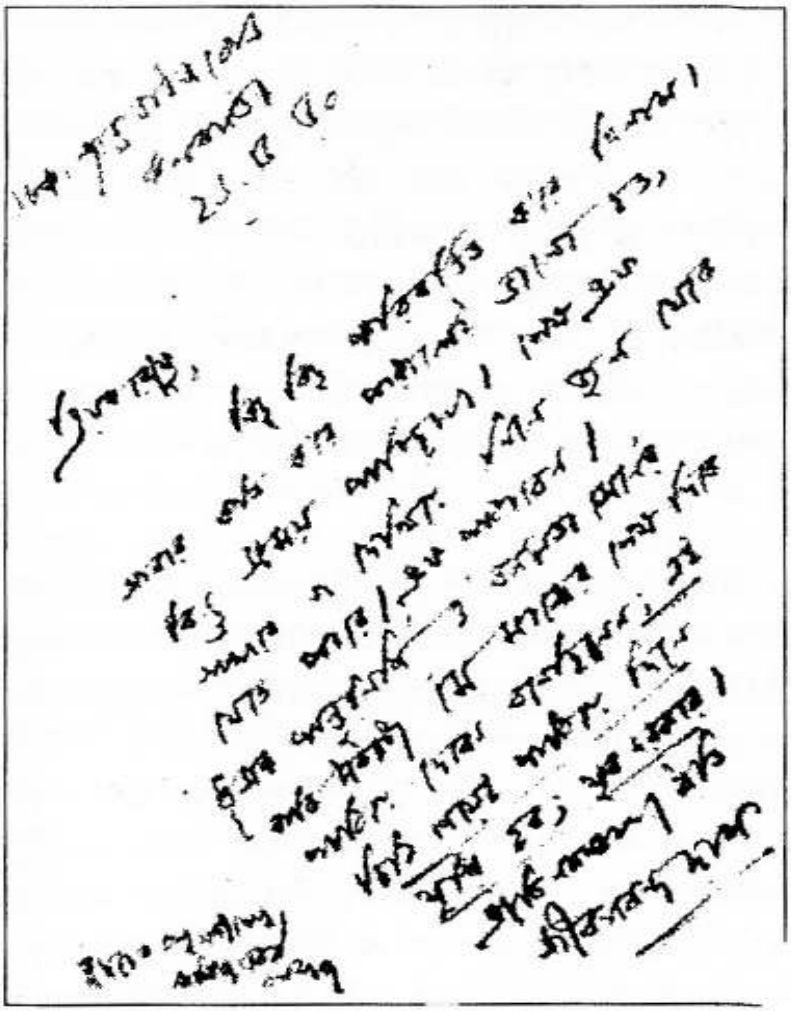

বুদ্ধদেবকে লিখিত জীবনানন্দের একটি চিঠি

জীবনবিমার সঞ্চয়, ওই তরুণের স্বোপার্জিত বৃত্তির সমস্ত টাকা, স্বর্ণপদক, দিদিমার অবশিষ্ট স্বর্ণালঙ্কার—সব। বুদ্ধদেব নামে এই যুবকটি কিন্তু কোনোদিন জীবনকে থামিয়ে রাখেননি সেইখানে, জীবনে যখন যে দায়িত্ব এসেছে তাঁর, প্রাণপণে তার দায় বহন করে গেছেন তিনি বিনা অজুহাতে। শখ তাঁর ছিল সত্যিই, ছিল শৌখিনতাও, সে উনিশ বছরে 'প্রগতি' প্রকাশের উন্মাদনাই হোক বা দিনে একটা সিগারেটের টিন শেষ করার নেশা, কিংবা, বিকেলে পাটভাঙা পাঞ্জাবি-পাজামা পরবার অভ্যাস; কিন্তু ওই প্রথম তারুণ্যের দিনগুলি থেকেই এ সমস্তই মিটিয়ে এসেছেন তিনি নিজের উপার্জনে, রিপন কলেজ আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্পস্থায়ী অধ্যাপনা-জীবন বাদ দিলে আজীবন বেকারই ছিলেন বুদ্ধদেবও, লেখার আয়েই সংসার চালিয়ে এসেছেন বিবাহিত এবং অবিবাহিত জীবনেও, 'হাঁড়ি-চড়ানো কলম' দিয়েই অনুবাদ করেছেন, পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন, খবরের কাগজের তৃতীয় সম্পাদকীয় লিখে আয় করেছেন, সারা রাত জেগে উপন্যাস লিখে সকালবেলা ছুটেছেন প্রকাশকের দরজায়, কিন্তু সারা জীবনে তিলমাত্র অনুযোগ করেননি কখনো ভাগ্যের কাছে, এক মুহূর্তের জন্য অজুহাত খোঁজেননি কেন তাঁকেই বাঁচতে হচ্ছে এইভাবে।

জীবনানন্দের এ-উপন্যাস আর একবার পড়তে বসে খুব কষ্ট হলো তাই আবারও, কষ্ট হলো নিখিলের দিকে তাকিয়ে। আবার চোখ পড়লো জীবনানন্দের কলমে গড়া সফল আত্মতৃপ্ত বাণেশ্বরের স্থূলতার দিকে, আবার কানে ভেসে এল তার দিকে চেয়ে নিখিলের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের উচ্চারণ, 'বাণেশ্বর নাক সিটকে শৌখিন কুকুরের মত হাসতে লাগল'। আবারও, বুঝতে পারলাম না কিছুতেই, কতখানি বিরূপতা, বিরাগ আর বিতৃষ্ণা জমা হয়ে আছে নিখিলের মনে আর নিখিলের স্রষ্টার বুকের গভীরে, নইলে সাহিত্য-সহযাত্রী কারো মুখেরই এই ক্যারিকেচার কি আঁকতে পারতেন তিনি? গড়পড়তা পাঠকের জন্য নির্ধারিত প্রধান আর গৌণ যে তিন সাহিত্যিকের নাম, প্রিয় সেই তিন কবির মুখই ভেসে এল মনে, ভেসে চলে গেল তিনটি মুখই, পূর্বসূরীদের ভালোবাসায় মাখা কোনো মুখের আদলেই শৌখিন কুকুরের নাক সিটকানো হাসি-ভরা এই মুখটিকে আঁকতে পারলাম না আজও কিছুতেই।

তিন.

বুদ্ধদেব লিখেছিলেন, বুদ্ধদেব ভেবেছিলেন, আজীবন এই বিশ্বাসই বহন করে গিয়েছিলেন যে, জীবনানন্দ ছিলেন 'সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ'; কিন্তু কবিতা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও যে সোচ্চার ছিল তাঁর লেখনী, সে-পরিচয় তো আমরা পেতে শুরু করেছি তাঁর প্রয়াণের পর। এক নতুন জীবনানন্দ উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে শুরু করেছেন আমাদের সামনে, 'সুতীর্থ', 'মাল্যবান', 'জলপাইহাটি', 'কারুবাসনা'-র পাতা থেকে।

এক যুগ আগে, ২০০৪ সালে, 'সফলতা-নিষ্ফলতা' নামে এ-উপাখ্যানখানি প্রকাশ পেয়েছে প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্‌স্ থেকে, এতগুলো দিন পেরিয়ে এসেও মনে হয়, কী ক্ষতি হতো আমাদের এই অচেনা মুখের ছায়ায় এসে না দাঁড়ালে? নির্জন এক কবির গহন মনের বিষণ্ণ কথামালায় কান পেতে শুনে নিতে না চাইলে? বাণেশ্বর আর নিখিলের আড়ালে নিশ্চিত আর অনিশ্চিত যে মুখই থাকুক, অগণ্য বাঙালি পাঠক কত দিন ধরে তাঁদের

ভালোবেসে এসেছেন, কতটুকু লাভ হলো তাঁদের এই অজানা কুয়াশামাখা খাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে? আবার মনে হয়, হলো হয়তো কোনো লাভ, শেষ পর্যন্ত মেনে তো নিতেই হয়, 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে'।

তবে, এই আখ্যানের পরিসরের বাইরে দাঁড়িয়ে সম্পর্কের চেনা ছবিখানিও তো আজও উজ্জ্বল রেখাতেই আঁকা রয়ে গেছে, সেই সত্য-ছবিখানিও আঁকা রয়ে যাবে চিরকালের বাঙালি পাঠকের মনের গভীরে, প্রতিভা বসুর বয়ানে ধরা আছে সেই ছবি, আছে বুদ্ধদেব বসুর কলমের আঁচড়েও।

প্রতিভা বসুর স্মৃতির ঝাঁপি খুলে দেখি, বিরাম মুখোপাধ্যায়ের কাছে দুর্ঘটনার খবর পাওয়ামাত্রই প্রতিভাকে নিয়ে বুদ্ধদেব পৌঁছেছিলেন শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে, প্রতিভা লিখেছেন, তখনও জ্ঞান ছিল জীবনানন্দের, জানিয়েছেন, ওই অবস্থাতেও

> (জীবনানন্দ)....আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন। অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করলেন 'বুদ্ধদেব'। বুদ্ধদেব চোখের জল সামলাতে পারছিলেন না। বারে বারে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে লাগলেন। মানুষটির সারা শরীর ব্যাণ্ডেজে মোড়া। তারই মধ্যে একটা হাত বুদ্ধদেবের দিকে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। বুদ্ধদেব তাড়াতাড়ি নিজের হাতটা বাড়িয়ে তাঁর হাতটা ধরলেন।..... মনে হচ্ছিল কিছু বলতে চান। ঠোঁট নড়ছিল কিন্তু শব্দ হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পরে সকলকে খুব সন্ত্রস্ত বলে মনে হল। বলল বিধান রায় এসেছেন ওঁকে দেখতে। আমরাও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। জীবনানন্দ চোখ বুজে ফেললেন।

বাঙালি পাঠকের চোখ ভরে দিয়ে জেগে রইলো প্রতিভা বসুর কলমে আঁকা জীবনানন্দের শেষশয্যার এই ছবিখানি আর তার মনে রয়ে গেল বুদ্ধদেবের সেই কথাগুলি, জীবনানন্দ-প্রয়াণের পর যা লিখেছিলেন তিনি,

> বাংলা কবিতার যতগুলো পংক্তি বা স্তবক আমার বিবর্ধমান বিস্মরণশক্তি এখনও হারিয়ে ফেলেনি, কিংবা পরিবর্তমান রুচি বর্জন করেনি, যেগুলোকে আমি বহু বছর ধরে অনেকটা রক্ষাকবচের মতো মনে-মনে বহন করে আসছি, তার মধ্যে জীবনানন্দের পংক্তির সংখ্যা অনেক। সেই সব কবিতা বেঁচে আছে আমার মনে, অন্য অনেক পাঠকেরও মনে—ভাবী কালেও বেঁচে থাকবে; তবু আজ এই কথা ভেবেই দুঃখ করি যে আমাদের পক্ষে স্বল্প পরিচিত সেই মানুষটিকে আর চোখে দেখবো না।

সব নিষ্ফলতা পেরিয়ে, সব ব্যবধান মুছে ফেলে এই তো এক সম্পর্কের সফলতা।